



Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)

A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture

Volume - v, Issue - iii, Published on July issue 2025, Page No. 191 - 199

Website: <https://tirj.org.in>, Mail ID: info@tirj.org.in

(SJIF) Impact Factor 7.998, e ISSN : 2583 - 0848

রবীন্দ্র ছোটগল্পে তিনকন্যা : রতন, উমা ও সুভা

নগেন মুর্মু

সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ

বিধান চন্দ্র কলেজ, হুগলি

Email ID : nagenakna@gmail.com

Received Date 25. 06. 2025

Selection Date 20. 07. 2025

Keyword

Child
psychology,
19th century,
social reform,
women
education.

Abstract

The short stories in Rabindranath Tagore's collection of stories are like a treasure trove of gems, where various child and adolescent characters are spread like countless pearls. From there, a few pearls are collected and arranged to form a garland. Three teenage characters have been selected from the numerous characters in the collection of stories, Ratan (Postmaster), Uma (Khata) and Subha (Subha). Each character is brilliant in its own way. Reading the selected stories, it is understood that the storyteller has very skilfully developed their mental development. The storyteller has very consciously applied the characters' behaviour, behaviour, and dialogue. As child and adolescent characters, they have become attractive and realistic. An attempt has been made to analysed the psychological aspects of these teenage characters from a new perspective.

Discussion

বাংলা সাহিত্যে শিশু এবং কিশোর-কিশোরী চরিত্র বহু সাহিত্যিক সৃষ্টি করে গেছেন। রবীন্দ্র পূর্ববর্তী বা পরবর্তী বাংলা সাহিত্যের সর্বশাখায় আমরা এই শ্রেণির চরিত্রের পরিচয় পেয়েছি। যে কজন সাহিত্যিক শিশু-কিশোর চরিত্র সৃষ্টিতে বাংলা সাহিত্যে বিখ্যাত হয়ে আছেন তাদের মধ্যে অন্যতম দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার, উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী, অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, সুকুমার রায়, সত্যজিৎ রায় প্রমুখ। তাদের সৃষ্টি চরিত্রগুলি যেমন বাংলা সাহিত্যের পাঠকদের মুগ্ধ করেছে, তেমনি শিশু-কিশোর চরিত্রের মনস্তাত্ত্বিক এবং কল্পনা বা ভাবনার বৈচিত্র্যকে প্রকাশ করেছে। কৌতুহলী মন এবং রূপকথার জগতের কল্পনা বিলাসী মনের স্বাক্ষর দিয়েছে এইসব সাহিত্যিকের সৃষ্টি চরিত্রগুলি। বাংলা সাহিত্যে অসংখ্য শিশু-কিশোর চরিত্র থাকলেও রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের হাত ধরেই যেন আমরা পরিপূর্ণ বাস্তব জগতের রক্ত মাংসের চরিত্রের দেখা পাই। তিনি শিশু-কিশোর মনকে নিবিড় ভাবে এবং বাস্তবতার সঙ্গে পর্যবেক্ষণ করেছেন। তার গল্পগুলি যখন আমরা পাঠ করি তখন মনে হয় যেন চরিত্রগুলি আমাদের পারিপার্শ্বিক সমাজে অবস্থিত। গ্রাম বাংলার বাস্তব জীবন ও সমাজ থেকে তাদের তুলে এনে গল্পে ঠাঁই দিয়েছেন। চরিত্রগুলির ছোটো খাটো চাওয়া পাওয়া, সুখ-দুঃখ, আনন্দ-বেদনা যেন পাঠকদের একাত্ম করে দেয়। রবীন্দ্রনাথের সৃষ্টি চরিত্রগুলি গ্রাম বাংলার হৃদয়প্রসূ বা মধ্যবিত্ত পরিবারে বেড়ে ওঠা। সামান্য কিছুতে যেমন তারা আনন্দ পায়, তেমনি সামান্য হতাশাতেই ভেঙে পড়ে। মান-অভিমানের দোলাচলে তাদের মন কখন যে শৈশবের হাত ধরে কৈশোরে এবং কৈশোর থেকে যৌবনে পদার্পণ করেছে তা পাঠককে মাঝে মাঝে হতবাক করে দেয়। তাঁর সৃষ্টি শিশু-

কিশোর চরিত্র পরিবেশ পরিস্থিতির মাঝে পড়ে পরিণত মানুষের মতো আচরণ করেছে। এমনই কিছু চরিত্র নিয়ে আজকের এই আলোচনা।

বাংলা সাহিত্যে এমন কোনও শাখা নেই যেখানে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের লেখনি স্পর্শ করেনি। সর্বক্ষেত্রে তার অবদান শ্রেষ্ঠত্বের দাবি রাখে। তার রচিত নাটক, উপন্যাস এবং কবিতায় বহু শিশু-কিশোর চরিত্রের পরিচয় পাওয়া যায়। কিন্তু গল্পগুচ্ছের অন্তর্গত ছোটগল্পগুলি যেন এক একটি রত্ন ভান্ডার, যেখানে ছড়িয়ে রয়েছে অসংখ্য মুক্তো দানার মতো নানান শিশু-কিশোর চরিত্র। সেখান থেকেই কয়েকটি মুক্তো দানা সংগ্রহ করে মালা গাঁথার আয়োজন। গল্পগুচ্ছের অসংখ্য চরিত্র থেকে নির্বাচন করা হয়েছে তিনটি কিশোরী চরিত্রকে, রতন (পোস্টমাস্টার), উমা (খাতা) ও সুভা (সুভা)। প্রতিটি চরিত্রই আপন গুণে উজ্জ্বল। নির্বাচিত গল্পগুলি পাঠ করলে বোঝা যায় গল্পকার খুব কুশলতার সঙ্গে তাদের মানসিক বিকাশ সাধন করেছেন। চরিত্রগুলির ব্যবহার, আচার-আচরণ, কথোপকথন খুব সচেতন ভাবেই গল্পকার প্রয়োগ করেছেন। শিশু-কিশোর চরিত্র হিসেবে সেগুলি আকর্ষণীয় এবং বাস্তব সম্মত হয়েছে।

শিশু-কিশোর মনের মধ্যে স্নেহ, মান-অভিমানের দোদুল্যমানতা এবং আত্মীয়তা ও ভালোবাসা খুব স্পষ্ট ভাবে লক্ষ্য করা যায়। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ‘পোস্টমাস্টার’ গল্পের রতন চরিত্রের মধ্য দিয়ে এই বৈশিষ্ট্যগুলিকে সুন্দরভাবে প্রকাশ করেছেন। ‘পোস্টমাস্টার’ গল্পটি ‘হিতবাদী’ পত্রিকায় ১২৯৮ বঙ্গাব্দে প্রকাশিত হয়েছিল। এই গল্পে ‘রতন’ নামে একটি অনাথা বালিকার কথা রয়েছে। তার বয়স বারো কি তেরো। তার ছোট ভাই ছিল, কিন্তু বর্তমানে নিজের বলতে কেউ নেই। তাদের উলাপুর গ্রামে একটি পোস্ট অফিস রয়েছে সেখানেই কর্তব্যরত পোস্টমাস্টারের দেখাশোনা করেই তার জীবন কেটে যায় এবং দুবেলা খাবার যোগাড় করে নেয়। গল্পে আমরা তার প্রথম পরিচয় পাই এভাবে। গল্পকার জানিয়েছেন –

“পোস্টমাস্টারের বেতন অতি সামান্য। নিজে রাধিয়া খাইতে হয় এবং গ্রামের একটি পিতৃ-মাতৃহীন অনাথা বালিকা তাহার কাজকর্ম করিয়া দেন। চারিটি চারিটি খাইতে পায়। মেয়েটির নাম রতন। বয়স বারো তেরো। বিবাহের বিশেষ সম্ভাবনা দেখা যায় না।”^২

এই গল্পে রতনকে এমন ভাবে গড়ে তোলা হয়েছে যেখানে তার শৈশবের কোন সঙ্গী নেই। ছোট ভাই ছিল যার সাথে সে খেলা করতো, গাছের ডাল ভেঙে ছিপ তৈরি করে ডোবার ধরে দুজনে মাছ ধরতো। কিন্তু সেই ছোট ভাইটিও নেই, কথা বলার জন্য বা সময় কাটানোর জন্য রতনের সমবয়সী উলাপুর গ্রামে কেউ নেই, অন্তত গল্পকার সেরকম কোন ইঙ্গিত দেননি। সুতরাং রতনের সারাদিন কাটে ওই পোস্টমাস্টারের নানান ফরমাইশ পূরণ করতে করতে। কর্মসূত্রে যে পোস্টমাস্টারই আসুক তাকে সেবা করা, তার কাজকর্ম করে দেওয়াই ছিল রতনের দায়িত্ব। বলা যায় সারাদিনের সময় কাটানোর অবলম্বন। গল্পে উল্লিখিত বর্তমান পোস্টমাস্টারের বিশেষ কিছু কাজ থাকতো না, তাই সে দিনের বেশিরভাগ সময় রতনের সঙ্গে গল্প করেই কাটাতো। তাদের কথাবার্তায় বেশিরভাগ সময় উঠে আসতো একে অপরের পরিবারের কথা। পোস্টমাস্টার রতনকে জিজ্ঞেস করে – “আচ্ছা রতন, তোর মাকে মনে পড়ে?” ভূতপূর্ব কোনও পোস্টমাস্টার হয়তো রতনের সঙ্গে এত আন্তরিকতার সঙ্গে কথা বলেনি। বর্তমান পোস্টমাস্টার নির্দিষ্ট রতনের কাছে নিজের পরিবারের কথা মন খুলে বলতে পারে। পোস্টমাস্টারের কথা শুনে রতন চিরপরিচিতের মতো সবাইকে নিজের মা, দিদি, ভাই বলে আপন ভেবে নেয়। গল্পকার খুব সচেতন ভাবে পোস্টমাস্টারের সঙ্গে রতনের সম্পর্কে নিবিড় পারিবারিক বন্ধনে আবদ্ধ করে দিয়েছেন। রতনের যেন কখনও মনে হয়নি দাদাবাবু অর্থাৎ পোস্টমাস্টার ভিন্ন কেউ। একান্ত নিজের আপন বলেই মনে হয়েছে তাকে, যাকে মন খুলে সবকিছু বলতে পারে। পোস্টমাস্টারকে কেন্দ্র করে রতনের কিশোরী হৃদয়ে তৈরি হয়েছে এক ভরসার জায়গা। তাদের সম্পর্ক আরো দৃঢ় ও গভীর হয় যখন পোস্টমাস্টার অসুস্থ হয়ে পড়ে। রোগকাতর শরীরে যে সময় পুরুষ মানুষ একজন স্নেহময়ী নারীর সেবা কামনা করে, ঠিক সেই সময় সে রতনকে পাশে পায়। রতন সেই স্নেহময়ী নারী রূপে তার কাছে আবির্ভূত হয়। বালিকা রতন তখন আর বালিকা থাকে না, সে হয়ে ওঠে এক স্নেহময়ী নারী, যার পরম যত্ন ও সেবায় পোস্টমাস্টার সুস্থ হয়ে ওঠে। সেই মুহূর্তে রতনের মধ্যে গল্পকার একজন পরিপূর্ণ নারীর সমস্ত গুণ আরোপ করেছেন। হতে পারে রতন বয়সে ছোটো, বিবাহের কোনও সম্ভাবনা নেই, কিন্তু কর্মদক্ষতায় এবং স্নেহপরায়ণতায় একজন পূর্ণ বয়স্ক নারীর থেকে কোনও অংশে কম নয়। পোস্টমাস্টারের রোগ সেবার বর্ণনায় আমরা তার পরিচয় পাই।

বৈদ্যকে ডেকে এনে, সারারাত মাথার কাছে বসে ওষুধ খাওয়ানো এবং মাঝে মাঝে দাদাবাবুকে শারীরিক অবস্থার কথা জিজ্ঞাসা করে এক দায়িত্বশীল নারীর পরিচয় দিয়েছিল। রতন শৈশব থেকে কৈশোরের সিঁড়ি বেয়ে কখন যে যৌবনে পদার্পণ করেছে তার আভাস রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর অল্প কথায় খুব সচেতন ভাবেই দেখিয়েছেন গল্পের পরবর্তী অংশে। আমরা দেখি রোগমুক্ত হয়ে যখন পোস্টমাস্টার চাকরিতে ইস্তফা দিয়ে কলকাতায় ফিরে যেতে চেয়েছে। সেই সংবাদ সব থেকে বেশি আঘাত করেছিল রতনের মনে। তার মনের অভিব্যক্তি গল্পকার এভাবে প্রকাশ করেছেন। গল্পকথক বলেছেন -

“পোস্টমাস্টার বলিলেন - রতন, কালই আমি যাচ্ছি।

রতন - কোথায় যাচ্ছ দাদাবাবু?

পোস্টমাস্টার - বাড়ি যাচ্ছি।

রতন - আবার কবে আসবে?

পোস্টমাস্টার - আর আসবো না।

রতন আর কোনো কথা জিজ্ঞাসা করিল না।”^৩

রতনের এই চুপ হয়ে যাওয়া, কোনও প্রশ্ন না করা, কোনও রকম আগ্রহ প্রকাশ না করা, এটা বালিকা বা কিশোরী চরিত্রের বৈশিষ্ট্য নয়। তার চুপ থাকার মধ্যেই রয়েছে পরিণত মানসিকতার পরিচয়। কথা বলে, প্রশ্ন করে, নিজের কষ্ট বাড়াতে চাইনি, বরং চুপ থেকে প্রসঙ্গ এড়িয়ে যেতে চেয়েছে। রতনের এই আচরণ পাঠককে সত্যিই হতবাক করে। সে শান্তভাবে নিজের দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন করে গেছে। পরের দিন দাদাবাবু হয়তো সকালেই কলকাতায় ফিরে যাবেন তাই যাবার সময় যেন কোনও রকম অসুবিধা না হয়, সেই কথা ভেবে ভোরবেলা নদী থেকে স্নানের জন্য জল তুলে রাখে। পোস্টমাস্টার যাবার জন্য প্রস্তুত হয়ে শেষবারের মতো রতনকে কাছে ডেকে নেয়। দাদাবাবুর ডাকে আগের মতো উৎসাহ রতনের মধ্যে দেখা যায় না। সে শুধুমাত্র প্রভুর আদেশের অপেক্ষা করে মাত্র। পোস্টমাস্টার রতনকে বলে যায় -

“রতন, আমার জায়গায় যে লোকটি আসবেন, তাকে বলে দিয়ে যাব। তিনি তোকে আমারই মতন যত্ন করবেন। আমি যাচ্ছি বলে ভাবতে হবে না।”^৪

কথাগুলো পোস্টমাস্টার অত্যন্ত স্নেহ ভাবেই বলেছিল তাতে কোনও সন্দেহ নেই, কিন্তু রতনের মনে অন্য কিছু ছিল। সে দাদাবাবুকে এভাবে হারাতে চাইনি। থাকতে চেয়েছিল তার সঙ্গে। যেতে চেয়েছিল কোলকাতায়। কিন্তু বার বার রতনের কানে ভেসে উঠছিল দাদাবাবুর সেই কথা, যখন সে জিজ্ঞেস করেছিল -

“দাদাবাবু আমাকে তোমাদের বাড়ি নিয়ে যাবে?

পোস্টমাস্টার হেসে বলেছিল - সে কি করে হবে?”^৫

ব্যাপারটা যে কী কী কারণে অসম্ভব রতন হয়তো সেই মুহূর্তে ভাবতে পারিনি। তার কাছে বিষয়টা খুবই সহজ সরল ছিল। গল্পের কাহিনি যত এগিয়েছে ততই রতনের মনের মনস্তাত্ত্বিক দিক পাঠকের সামনে প্রকাশিত হয়েছে। পোস্টমাস্টার যখন নিজের যাতায়াতের খরচা বাদে বেতনের সমস্ত টাকা রতনকে দিতে চেয়েছিল, রতন সেই টাকা ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছিল। দাদাবাবুকে সে বুঝিয়ে দিয়েছিল, টাকার জন্য সে এতদিন সেবা করেনি। হয়তো রতনের মনের গহীন অরণ্যে দাদাবাবুর জন্য ভালোবাসার ফুল প্রস্ফুটিত হয়েছিল। সেই ফুলের সুগন্ধ পোস্টমাস্টারকে স্পর্শ করতে পারেনি বা স্পর্শ করতে চাইনি। তাই রতনের ভালোবাসার প্রতিদান টাকার বিনিময়ে শোধ করতে চেয়েছিল। হয়রে পুরুষ মন, নারীর হৃদয় কখনোই বুঝলো না। নারীর ভালোবাসা এতই তুচ্ছ যা সামান্য টাকার বিনিময়ে পরিশোধ করা যায়? রতনের ভালোবাসা ছিল অমূল্য। পোস্টমাস্টারের এই আচরণে রতন প্রচণ্ড অভিমানী হয়ে তার পা জড়িয়ে ধরে বলেছিল -

“দাদাবাবু তোমার দুটি পায়ে পড়ি, আমাকে কিছু দিতে হবে না। তোমার দুটি পায়ে পড়ি, আমার জন্য কাউকে কিছু ভাবতে হবে না।”^৬

সহৃদয় গল্প পাঠক হিসেবে আমাদের বুঝতে অসুবিধা হয় না রতনের এই আচরণ সামান্য বালিকার মতো নয়। বারো তেরো বছরের রতন সেই মুহূর্তে পরিপূর্ণ নারীতে পরিণত হয়ে গেছে। রতনের হৃদয় বেদনার কথা পাঠক অনুভব করতে পারে। কৈশোর বয়সের মনস্তত্ত্বের এই জটিল দিকের পরিচয় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর অত্যন্ত স্পর্শকাতর ভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন।

গ্রামবাংলার সাধারণ গৃহস্থ পরিবারে বেড়ে ওঠা শিশু-কিশোর চরিত্রের পরিচয় পাই ‘সুভা’ গল্পের সুভাষিনী চরিত্রের মধ্য দিয়ে। গল্পটি ‘সাধনা’ পত্রিকায় ১২৯৯ বঙ্গাব্দে প্রকাশিত হয়েছিল। গল্পের মূল চরিত্র সুভাষিনী। বলা হয় শিশু মাত্রই ঈশ্বরের রূপ, শিশুর হৃদয়েই ঈশ্বরের বাস। বিশেষ করে শারীরিক ভাবে অক্ষম শিশুরা যেন ঈশ্বরের ছত্র ছায়াতেই বেড়ে ওঠে। প্রকৃতির সাথে তাদের এক নিবিড় সম্পর্ক আপনা থেকেই তৈরি হয়ে যায়। প্রকৃতি যেন নিজ থেকেই এমন শিশুদের কাছে টেনে নেয়। সবাই যখন প্রতিবন্ধকতার অজুহাতে তাদের দূরে সরিয়ে রাখে তখন প্রকৃতি দু-হাত বাড়িয়ে তাদের আপন করে নেয়। প্রকৃতির সমস্ত বস্তু যেন তাদের কাছে নতুন নতুন রূপে ধরা দেয়। এমনই একটি কিশোরী চরিত্র নিয়ে ‘সুভা’ গল্পটি রচিত হয়েছে।

সুভাষিনী পিতা-মাতার তৃতীয় সন্তান। বড় দুই বোন সুকেশিনী ও সুহাসিনীর বিয়ে হয়ে গেছে। সুভাষিনী জন্মগত বোবা। এই কারণে সে নিজেকে সবার থেকে সব সময় লুকিয়ে রাখার চেষ্টা করে। মনে মনে ভাবে এই জগত সংসারে সবাই যদি তাকে ভুলে থাকে তাহলে কত ভালোই না হত। সুভাষিনীকে সবাই সুভা নামে ডাকতো। তার মুখে ভাষা না থাকলেও চোখের ভাষা ছিল অসীম, উদার এবং অতল স্পর্শ গভীর। অনেকটা স্বচ্ছ আকাশের মত উদয়াস্ত, ছায়ালোকের এক নিস্তব্ধ ভূমি। হয়তো এই কারণেই অন্যান্য বালক বালিকা তার সাথে খেলা করতে ভয় পেতো। সে নির্জন শান্ত দুপুরের মতো নিস্তব্ধ এবং সঙ্গীহীন থাকত। বাস্তবে এরকম চরিত্র আমরা দেখে থাকি যারা শারীরিক ভাবে অক্ষম। সবার মাঝে থেকেও তারা যেন একা। পরিবারের সবার স্নেহ ভালোবাসা থেকে বঞ্চিত থাকে। তাদের একমাত্র আশ্রয় হয় প্রকৃতির কোলে। সুভার ক্ষেত্রেও আমরা একই ঘটনা দেখি। সমস্ত শিশুরা যখন নিজের নিজের বন্ধুদের সঙ্গে খেলতে ব্যস্ত থাকে তখন সুভা কাজের অবসরে নদী তীরে গিয়ে পৃথিবীর অপরূপ সৌন্দর্যকে নতুন রূপে অনুধাবন করে। সে যেন প্রকৃতির সাথে নিজের সুখ দুঃখের কথা ভাগ করে নেয়। প্রকৃতিও যেন তার ভাষার অভাব পূরণ করে তার হয়ে কথা বলে। গল্পকার বর্ণনা করেছেন –

“প্রকৃতি যেন তার ভাষার অভাব পূরণ করিয়া দেয়। যেন তাহার হইয়া কথা কয়, নদীর কলধ্বনি, লোকের কোলাহল, মাঝির গান, পাখির ডাক, তরুণ মর্মর, সমস্ত মিশিয়া চারিদিকের চলাফেরা আন্দোলন কম্পনের সহিত এক হইয়া সমুদ্রের তরঙ্গ রাশির ন্যায় বালিকার চির নিস্তব্ধ হৃদয় উপকূলের নিকটে আসিয়া ভাঙিয়া ভাঙিয়া পড়ে।”^১

সুভার কোনও বন্ধু ছিল না এমনটা নয়। গুটিকয়েক অন্তরঙ্গ বন্ধু ছিল, তাদের মধ্যে দুটি গাভী এবং গাঁসাইদের ছোট ছেলে প্রতাপ। এছাড়াও ছিল কয়েকটি ছাগল ছানা এবং একটি বিড়াল শাবক, এদের নিয়ে সুভার জীবন। বাড়িতে যখনি তাকে বকাঝকা খেতে হয় তখনই সে হাজির হয় গোয়াল ঘরে তার দুই প্রিয় বন্ধুর কাছে। অবলা প্রাণী দুটি যেন সুভার চোখের দিকে তাকিয়ে বুঝে নিত তার মর্ম বেদনার কথা। গাভী দুটি সঙ্গে সঙ্গে সুভার গা ঘেঁষে এসে তাকে ব্যাকুলতার সঙ্গে সান্ত্বনা দেওয়ার চেষ্টা করত। প্রকৃতির সঙ্গে সুভার এই নিবিড় সম্পর্ক সত্যিই অকল্পনীয়। সুভার হৃদয় এবং অবলা দুই প্রাণীর হৃদয় এক সূত্রে বাঁধা ছিল। তারা যেন একে অপরের ভালোলাগা, মন্দলাগা সমস্ত অনুভূতি টের পেয়ে যেত। প্রকৃতি প্রেমিক রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর খুব সুন্দর ভাবে শিশু হৃদয়ের সঙ্গে প্রকৃতিকে একাত্ম করে দেখিয়েছেন।

শুধু অবলা প্রাণী দুটি নয়, সুভার সঙ্গে বন্ধুত্ব ছিল গ্রামের এক অকর্মণ্য ছেলের। গাঁসাইদের ছোটো ছেলে প্রতাপ। সে বাড়ির দায়িত্ব থেকে নিজেকে দূরে সরিয়ে রেখে মনের আনন্দে ঘুরে বেড়াতো। তার বাবা-মা অনেক চেষ্টার পরে তাকে নিয়ে সমস্ত আশা ছেড়ে দিয়েছিল। তাই তার খোঁজ খবর বিশেষ কেউ রাখত না। প্রতাপের প্রধান সখ ছিল ছিপ ফেলে মাছ ধরা। মাঝে মাঝে দুপুর বেলা বেশিরভাগ সময় নদীর ধারে তাকে পাওয়া যেত। সেই সূত্রে সুভার সাথে তার প্রায় দেখা হতো। বিশেষত সুভা কথা বলতে পারে না বলে প্রতাপের তাকে বেশ পছন্দ। কারণ মাছ ধরার সময় এরকম নির্বাক ও শান্ত সঙ্গী সব থেকে বেশি জরুরি। সুভার মতে এই বিশ্বসংসারে প্রতাপ একমাত্র মানুষ যে তার গুরুত্ব বোঝে, সুভার সাথে ভালোভাবে কথা বলে, তার তালে তাল মেলায়। হয়তো এই কারণেই সুভা প্রতাপ এর সঙ্গে থাকতে পছন্দ করে। সে প্রাণপণে চেষ্টা করে প্রতাপকে কোনও ভাবে সাহায্য করতে। সে জানাতে চায় পৃথিবীতে সে কম প্রয়োজনীয় নয়। মনে মনে বিধাতার কাছে প্রার্থনা করে এমন কোনও অলৌকিক ক্ষমতা তাকে যেন দেওয়া হয় যা দিয়ে সে প্রতাপকে অবাক

করে দিতে পারবে। শিশু-কিশোর মনস্তত্ত্বের এ-এক আশ্চর্য দিক, যেখানে তারা যে কোনও উপায়ে প্রিয় মানুষটির কাছে নিজেকে যোগ্য এবং গুরুত্বপূর্ণ হিসেবে মেলে ধরতে চায়। সুভার মধ্যেও আমরা সেই প্রবণতা লক্ষ্য করতে পারি। রূপকথার রাজ্যের একমাত্র রাজকন্যা হয়ে সে প্রতাপকে সর্প দেবীর মূল্যবান মণি উপহার হিসেবে দিতে চায়। যা দেখে প্রতাপ তুচ্ছ মাছ ধরা ছেড়ে মণি নিয়ে নদীর জলে ডুব দিয়ে পাতাল রাজ্যে প্রবেশ করবে। সেখানে রুপোর অটালিকায় সোনার পালঙ্কে সুভা বসে থাকবে। শিশু-কিশোর হৃদয়ের কাল্পনিক ভাবনা যা তাদের অলৌকিক রূপকথার রাজ্যে নিয়ে যায় সুভার মধ্যেও আমরা সেই অলৌকিক ভাবনার প্রকাশ দেখি। কিন্তু কল্পনা তো কল্পনাই, বাস্তবে সে প্রতাপকে কিছুতেই আশ্চর্য করতে পারে না।

সুভার বয়স যত বাড়তে থাকে কন্যাদায়গ্রস্থ পিতা বাণীকর্ণের চিন্তা দিন দিন বেড়েই চলে। অবশেষে একদিন বোবা মেয়েটিকে পাত্রস্থ করার জন্য কোলকাতা যাওয়ার উদ্যোগ নেয়। এক অজানা বিপদের আশঙ্কায় সুভার মনের মধ্যে কালো মেঘ জমতে থাকে। সে বাবা-মায়ের কাছে সমস্ত কিছু বিশদে জানতে চায়, কিন্তু তারা কিছুই পরিষ্কার ভাবে তাকে বুঝিয়ে বলে না। এমন পরিস্থিতিতে একদিন দুপুরবেলা নদীর ধারে প্রতাপ এর সঙ্গে তার দেখা হয়। প্রতাপ তাকে হাসির ছলে জিজ্ঞাসা করে –

“কিরে সু, তোর নাকি বর পাওয়া গেছে, তুই নাকি বিয়ে করতে যাচ্ছিস?”^৮

কথাগুলি সহজ সরল মনে হলেও সুভার কাছে ততটা সহজ সরল ছিল না। এই কথার মধ্যে লুকিয়ে থাকা বেদনা একমাত্র অনুভব করতে পেরেছিল সুভা। সে যাকে মনে মনে হৃদয় কুঞ্জে স্থান দিয়েছিল তার মুখ থেকে এরকম কথা সে আশা করেনি সেই মুহূর্তে সুভা কোনও কথা বলতে পারেনি কিন্তু তার আচরণে প্রকাশ পেয়েছিল হৃদয়ের ব্যাকুলতা, এক অসীম শূন্যতা। লেখকের ভাষায় –

“মর্ম বিদ্ধ হরিণী ব্যাধের দিকে যেমন করিয়া তাকায়, নিরবে বলতে থাকে, আমি তোমার কাছে কি দোষ করিয়াছিলাম? সুভা তেমনি করিয়া প্রতাপ এর দিকে চাহিলো।”^৯

কতটা কষ্ট পেলে মানুষের এইরূপ অভিব্যক্তি মুখের চাহনির মধ্য দিয়ে প্রকাশ পায় তা পাঠকের বুঝতে অসুবিধা হয় না। সেদিন রাতে সুভা বাবার পায়ের কাছে বসে তার মুখের দিকে তাকিয়ে অনেক কেঁদে ছিল। কোলকাতা যাবার আগে সুভা তার প্রিয় বাল্য সখী গাভী দুটির কাছে শেষ বিদায় জানানোর সময়ও চোখের জল ফেলে ছিল। বিচ্ছেদ বেদনার এক করুণ ছবি আমরা সুভা চরিত্রের মধ্য দিয়ে দেখতে পাই। প্রকৃতির সঙ্গে তার যে নাড়ীর সম্পর্ক রয়েছে সেটা থেকে বেরিয়ে যাওয়ার ক্ষমতা সুভার হয়তো নেই। তাই সে প্রাণপণে প্রকৃতিকে আঁকড়ে রাখার চেষ্টা করেছে। প্রার্থনা করেছে প্রকৃতি যেন তাকে কোথাও যেতে না দেয়। মায়ের কাছে যেভাবে একটি অসহায় শিশু প্রার্থনা করে, ঠিক যেন সেই ভাবেই প্রকৃতিকে মা রূপে কল্পনা করে তার কাছে করুণ প্রার্থনা জানিয়েছে।

অন্তরের বেদনা যখন প্রকাশিত হওয়ার ভাষা খুঁজে পায় না, তখন হয়তো এভাবেই অশ্রুর সাহায্যে প্রকাশিত হয়। কৈশোর বয়সে বা বয়ঃসন্ধি কালে খুব সহজেই কোনও জিনিসের সঙ্গে বা কোনও মানুষের সঙ্গে আত্মিক সম্পর্ক তৈরি হয়ে যায়। তারপর যখন বিচ্ছেদের পরিস্থিতি তৈরি হয় তখন বাঁধ ভাঙা জলোচ্ছ্বাসের মতো হৃদয়াবেগ বেরিয়ে আসে। সুভার ক্ষেত্রেও তায় হয়েছিল। গল্পকার রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর সু-নিপুন ভাবে সুভা চরিত্রের এই মনস্তাত্ত্বিক দিকগুলিকে পাঠকের সামনে উপস্থাপন করেছেন।

উনবিংশ শতাব্দীতে নারীশিক্ষার প্রগতি নিয়ে বহু আন্দোলন সংঘটিত হয়েছে। সমাজের বহু সংখ্যক শিক্ষিত বিদ্বজ্জন উপলব্ধি করেছিলেন সমাজের ও জাতির উন্নতিতে শুধু পুরুষদের শিক্ষিত হিসেবে গড়ে তোলায় যথেষ্ট নয়, নারী এবং পুরুষ উভয়ের সমান সহযোগিতায় একটি শিক্ষিত জাতি গড়ে ওঠে। তাই পুরুষের পাশাপাশি নারীদের সমান ভাবে শিক্ষার আলোয় আলোকিত করা প্রয়োজন। কিন্তু এই ভাবনা বাস্তবায়িত করার ক্ষেত্রে বহু প্রতিবন্ধকতা লক্ষ্য করা যায়। সমাজের বহু সংখ্যক মানুষ নারীশিক্ষা বিরোধী ছিলেন। এমনকি কিছু কিছু পরিবারের সদস্যরাও চাইতো না নিজেদের বাড়ির মেয়েরা অন্তরমহল ছেড়ে বাইরে বেরিয়ে পুরুষদের সমকক্ষ হয়ে শিক্ষা গ্রহণ করুক। তাদের মতে, নারীর জন্ম কেবল সংসারের নিত্যকর্ম পরিচালনা করা এবং সন্তানের জন্ম দিয়ে তাদের প্রতিপালনের মধ্য দিয়ে বংশগৌরব রক্ষা করা।

কিন্তু তবুও ঊনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীতে নারী শিক্ষার এই প্রতিকূল পরিবেশের মধ্যেও বহু নারী সেই প্রতিকূলতাকে অতিক্রম করে প্রচলিত চিন্তা ভাবনাকে পরিবর্তন করে আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত হয়েছিলেন এবং নিজেদের স্বাধীন চিন্তার মধ্য দিয়ে সমাজের এবং জাতির উন্নতিতে অবদান রেখে গিয়েছিলেন। তেমনই কয়েকজন বিশিষ্ট নারী হলেন-- স্বর্ণকুমারী দেবী, বেগম রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন, সাবিত্রীবাঈ ফুলে, সুচেতা কৃপালিনী, জ্ঞানদানন্দিনী দেবী, মহাশ্বেতা দেবী প্রমুখ।

নারীশিক্ষা বিস্তারে সবথেকে বড় বাধা হলো পারিবারিক বিরোধিতা। আরও সহজ ভাবে বলতে গেলে পরিবারের সদস্যদের অনিচ্ছা। পারিপার্শ্বিক সমস্যা ও সমাজের বিরুদ্ধে গিয়ে হয়তো শিক্ষা অর্জন করার মানসিকতা তৈরি হয়ে উঠতে পারে কিন্তু পরিবারের সদস্যদের যদি সদিচ্ছা এবং সহযোগিতা না থাকে, তাহলে সেক্ষেত্রে শুধু শিক্ষা গ্রহণ কেন, যে কোনও কাজই অসম্পূর্ণ থেকে যায়। নারীশিক্ষা কেন্দ্রিক এমনই একটি গল্প হল ‘খাতা’। এই গল্পের কাহিনিতে আমরা পাই বালিকা উমার শৈশব থেকে শিক্ষারস্তু পর্ব এবং তার সাহিত্যচর্চা বিকাশের সম্ভাবনার কথা। পারিবারিক সহযোগিতা থাকলে হয়তো ভবিষ্যতে উমা একজন বিশিষ্ট সাহিত্যিক হয়ে উঠতে পারতো। সব থেকে বড় কথা হল সে একজন শিক্ষিত ও আধুনিক চিন্তাশীল মানুষ হিসেবে সমাজে নিজের অবদান রেখে যেতে পারতো। কিন্তু নারীশিক্ষা নিয়ে তাদের পরিবারের সংকীর্ণ মানসিকতা উমার স্বপ্ন পূরণে অন্তরায় হয়ে দাঁড়িয়েছিল। উমার মতো এরকম হাজার হাজার কন্যার লেখাপড়া শেখার স্বপ্ন, মুক্ত আকাশে ডানা মেলে ওড়ার স্বপ্ন সমাজ এবং পরিবারের চাপে অচিরেই ভেঙে চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যায়। তাদের পড়ে থাকতে হয় সংসার নামক এক অন্ধকার সংকীর্ণ খাঁচার ভিতর।

‘খাতা’ গল্পে আমরা দেখি উমা সবেমাত্র লিখতে শিখেছে। বাড়ির জ্বালানির কাজে ব্যবহৃত কয়লা দিয়ে সে তার প্রাথমিক শিক্ষার ছাপ সবত্র ছড়িয়ে দেয়। বাড়ির সমস্ত দেওয়াল জুড়ে আঁকা বাঁকা লাইন টেনে বড়ো বড়ো অক্ষরে লিখতে থাকে -

“জল পড়ে, পাতা নড়ে।”^{১০}

বউ ঠাকুরানীর ‘হরিদাসের গুপ্তকথা’ নামক বইয়ের সন্ধান পেয়ে তার পাতায় পাতায় লিখে ভর্তি করে দিয়েছিল --

“কালো জল, লাল ফুল।”^{১১}

সর্বদা ব্যবহৃত বাড়ির পঞ্জিকা হাতের কাছে পেয়ে সেখানেও নানা লেখায় পূর্ণ করে দেয়। এমনকি বাবার জমা খরচের খাতা পর্যন্ত বাদ যায় না। গল্পকার বলছেন -

“বাবার দৈনিক হিসাবের খাতায় জমা খরচের মাঝখানে লিখিয়া রাখিয়াছে - লেখাপড়া করে যেই, গাড়ি ঘোড়া চড়ে সেই।”^{১২}

ছোট্ট উমার এই বাল্য শিক্ষার আয়োজন প্রতিটি পাঠককে নিজেদের শৈশবের দিনগুলিতে ফিরিয়ে নিয়ে যায়। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর শিশুদের খুব নিবিড় ভাবে পর্যবেক্ষণ করতেন। তাদের শৈশব শিক্ষা পদ্ধতি, তাদের বিভিন্ন ছোটখাটো আচার-আচরণ, তাদের ছেলেমানুষী কর্মকাণ্ড, সমস্ত কিছু। আলোচ্য গল্পে উমার ব্যবহার এবং তার আচার-আচরণ তারই প্রমাণ দেয়। এই পর্যন্ত উমার শিক্ষা গ্রহণে কোন প্রকার বাধা আসেনি। সমস্যার সূত্রপাত সেই দিন যেদিন উমা দাদা গোবিন্দলালের বৈজ্ঞানিক গবেষণা মূলক রচনায় নিজের বাল্য শিক্ষার ছাপ রেখে দিয়েছিল। একদিন নির্জন দুপুর বেলা দাদার কালি কলম নিয়ে সেই প্রবন্ধের উপর বড়ো বড়ো অক্ষরে লিখে দিয়েছিল -

“গোপাল বড় ভালো ছেলে, তাকে যাহা দেওয়া যায় সে তাহাই খায়।”^{১৩}

উমার এই ছেলেমানুষী স্পর্ধার জন্য তার গুরুতর শাস্তি জুটে ছিল সেদিন। গোবিন্দলাল প্রথমে তাকে আঘাত করে তারপর পেঙ্গিল কলম এবং যাবতীয় লেখাপড়ার সরঞ্জাম কেড়ে নিয়েছিল। অপমানিত উমা সেদিন রাগে অভিমানে ঘরের কোণে বসে অনেক কেঁদে ছিল। পরবর্তী কালে গোবিন্দলাল অনুতপ্ত হয়ে উমার সমস্ত সরঞ্জাম ফেরত দিয়েছিল এবং উপহার হিসেবে একটি বাঁধানো লাইন টানা খাতা দিয়েছিল। সেই উপহার বালিকার শিক্ষার উন্নতির জন্য ছিল না, ছিল কেবল মাত্র তার হৃদয় বেদনা দূর করার জন্য। উমা হয়তো উপলব্ধি করতে পারেনি কিন্তু পাঠক হিসেবে আমাদের বুঝতে অসুবিধা হয় না। উমা সর্বদা সেই খাতাটিকে সঙ্গে সঙ্গে রাখত। প্রথম বছর অতি যত্নে সে লিখেছিল -

“পাখি সব, করে রব, রাতি পোহাইল।”^{১৪}

খাতার মধ্যে যা কিছু লেখে সব উচ্চস্বরে পড়তে থাকে। এমন ভাবেই অনেক গদ্য পদ্য তার খাতায় জমা হতে থাকে। দ্বিতীয় বছর অর্থাৎ উমার বয়স যখন নয় বছর তখন থেকেই তার মধ্যে স্বাধীনতার বিকাশ লক্ষ্য করা যায়। কিছু কিছু স্বাধীন রচনা সে লিখতে থাকে। লেখাগুলি ছোট হলেও মর্মবস্তুর অর্থ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। উমার লেখার বিষয় শুধুমাত্র সাহিত্যের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল না, ব্যক্তিগত ভাব ভাবনা, প্রিয়জনের প্রতি তার অনুভূতির বহিঃপ্রকাশও লক্ষ্য করা যায়। আত্মীয় ও বাল্যবন্ধুদের প্রতি তার ভালো লাগা, মন্দলাগা সমস্ত কিছুই সেই বাঁধানো লাইন টানা খাতার পাতা জুড়ে ছড়িয়ে থাকতো। এমন স্বাধীন ভাবে বিদ্যাচর্চা ও তার মানসিক বিকাশের মাঝে বাধা হয়ে আসে তৎকালীন সমাজ ব্যবস্থা ও পরিবারের সংখ্যা গরিষ্ঠ সদস্যদের সংকীর্ণ মানসিকতা। নয় বছর বয়সেই উমার বিবাহের আয়োজন শুরু হয়ে যায়। তৎকালীন চিরাচরিত সামাজিক নিয়ম ‘গৌরীদান’ প্রথার বলি হতে হয় উমাকে। তার সমস্ত ইচ্ছা, সমস্ত স্বপ্ন নিমেষে ধুলিস্যাৎ হয়ে যায়, সমাজে নিন্দার ভয়ে কন্যা উমাকে শশুরবাড়ি পাঠাতে বাধ্য হয়। গোবিন্দলালের সহযোগী লেখক প্যারীমোহনের সঙ্গে উমার বিয়ে ঠিক হয়। শশুরবাড়ি যাবার সময় তার মা বলে দিয়েছিল –

“বাছা, শাশুড়ির কথা মানিয়া চলিস, ঘরকন্যার কাজ করিস, লেখাপড়া লইয়া থাকিস নে।”^{১৫}

কন্যার প্রতি মায়ের এই আদেশ কোথাও না কোথাও আমাদের ব্যথিত করে। আমাদের মনে কিছু প্রশ্ন জাগতে বাধ্য করে। কন্যা সন্তান কি শুধু ঘরকন্যার কাজের জন্য? লেখাপড়া শেখা কি শুধুমাত্র পুরুষ মানুষদের জন্য? প্রশ্নগুলি তীরের মতো বিদ্ধ করে দিয়েছিল পাঠকদের এবং সমাজের সেই সমস্ত মানুষদের যারা নারীশিক্ষা বিরোধী ছিলেন। উমার দাদা গোবিন্দলাল উমাকে এক প্রকার সতর্কবাণী দিয়ে বলেছিল –

“দেখিস, সেখানে দেয়ালে আঁচড় কাটিয়া বেড়াস নে, সে তেমন বাড়ি নয়, আর প্যারীমোহনের কোনো লেখার উপরে খবর্দার কলম চালাস নে।”^{১৬}

কথাগুলি উমাকে লক্ষ্য করে বলা হলেও রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তৎকালীন সেই সমস্ত শিক্ষিত নারীদের উদ্দেশ্যে পুরুষতান্ত্রিক সমাজের সতর্কবাণী হিসেবে বলেছিলেন যারা আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে পুরুষতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থার এবং পুরুষের চোখে নারীর জীবনকে দেখার সংকীর্ণ মানসিকতার ভুল দ্রুতি গুলিকে যুক্তি দিয়ে সমালোচনায় বিদ্ধ করেছিল। নারীচিন্তা বা নারীশক্তিকে দমন করার এক অদৃশ্য কৌশল বলা যেতে পারে।

শশুরবাড়ি গিয়ে উমার বিদ্যাচর্চা প্রায় সম্পূর্ণ রূপে বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। সাহিত্য আলোচনা বা সমালোচনা থেকে সরে এসে সে শুধু আত্মীয় পরিজনের চিন্তায় মগ্ন থাকে। দুপুর বেলা একলা ঘরে দরজা বন্ধ করে টিনের বাক্স থেকে সেই বাঁধানো লাইন টানা খাতাটি বের করে চোখের জল ফেলতে ফেলতে লিখতে থাকে তার বন্ধু যশোদার কথা। কিছুদিন তার সাথে শশুরবাড়িতে থাকার পর যশোদা বাড়ি ফিরে গিয়েছিল, ব্যথিত হৃদয়ে উমা তাকে স্মরণ করে লিখেছিল –

“যশি বাড়ি চলে গেছে, আমিও মার কাছে যাব।”^{১৭}

দাদার কথা মনে পড়ে, মনে পড়ে যায় সেই দিনের কথা যেদিন সে দাদার লেখার উপর কলম চালিয়েছিল। হয়তো তার শাস্তি স্বরূপ তাকে শশুরবাড়ি পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। চারুপাঠ, বোধোদয় চর্চার সময় পায় না। মনের আনাচে কানাচে কেবল ঘুরতে থাকে বাড়ির কথা, দাদার কথা, মায়ের কথা, খাতার মধ্যে সে লিখে যায় –

“দাদা যদি একবার বাড়ি নিয়ে যায় তাহলে দাদার লেখা আর কখনো খারাপ করে দেব না।”^{১৮}

উমা আরো লেখে –

“দাদা তোমার দুটি পায়ে পড়ি, আমাকে একবার তোমাদের ঘরে নিয়ে যাও। আমি তোমাকে আর কখনো রাগাবো না।”^{১৯}

উমার এই বিলাপ পাঠকের মনে গভীর ক্ষত তৈরি করে। তৎকালীন সমাজের প্রথাগুলি উমার মতো হাজার হাজার কন্যার শৈশব ও কৈশোর এভাবেই কেড়ে নিয়েছিল। পড়াশোনা এবং খেলাধুলো করার বয়সে তাদের ঠেলে দিয়েছিল সংসার নামক যাঁতাকলে, যেখানে দিনের পর দিন নানান সামাজিক প্রথার নামে তাদের লাঞ্চিত হতে হত। গল্পকার রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর উমা চরিত্রের মধ্য দিয়ে সমগ্র সমাজ ব্যবস্থাকে ব্যঙ্গ ও নিন্দা করেছেন।

গল্পের পরবর্তী অংশে আমরা দেখি উমা শ্বশুরবাড়িতে একান্ত সংকুচিত হয়ে থাকে। দিনের পর দিন বাপের বাড়িতে যাওয়ার জন্য কাকুতি মিনতি করতে থাকে। কিন্তু তাকে যেতে দেওয়া হয় না। তার দাদা গোবিন্দলাল প্যারীমোহনের সাথে পরামর্শ করে তাকে বাপের বাড়ি আসতে বাধা দেয়। গোবিন্দলাল বলে –

“এখন উমার পতিভক্তি শিক্ষার সময়, এখন তাকে মাঝে মাঝে পতিগৃহ হইতে পুরাতন পিতৃশ্রুতের মধ্যে আনয়ন করিলে তাহার মনকে অনর্থক বিক্ষিপ্ত করিয়া দেওয়া হইবে।”^{২০}

গোবিন্দলালের এই বক্তব্যকে ভালো ভাবে দেখলে বোঝা যায় সে কখনোই চায়নি উমা শিক্ষার আলোয় আলোকিত হয়ে জগতকে জানুক। গোবিন্দলালের দৃষ্টিভঙ্গিতে নারীরা কেবল সংসার ও পতিভক্তির জন্য জন্মায়। নারীশিক্ষার প্রতি বিরুদ্ধ মনোভাব প্রকাশিত হয়েছে এই বক্তব্যের মধ্যে। উমা এমন এক শিক্ষিত পরিবারে জন্ম গ্রহণ করেও নিজে শিক্ষার আলো থেকে বঞ্চিত হয়েছে। তৎকালীন গ্রামবাংলার এমন অসংখ্য উমা ছিল যারা সাধারণ নিম্নবিত্ত বা মধ্যবিত্ত পরিবারে জন্মগ্রহণ করেছিল। তাদের কাছে ‘শিক্ষা’ নামক শব্দটাই হয়তো পৌঁছায় না। নারীশিক্ষাকে হয়তো একটা আত্মপ্রদায় বা এক সমাজ বিরোধী কাজ হিসেবে মনে করা হতো।

গল্পের শেষে আমরা দেখি একদিন শরৎকালে সকালে উমা জানালার গারদের ওপর মুখ রেখে চুপ করে বসে এক ভিখারীর আগমনীর গান মন দিয়ে শুনছিল। গানের কথা শুনতে শুনতে তার ছোটবেলার সমস্ত কথা মনে পড়ে যায়। গান শুনে উমা চুপ করে বসে থাকতে পারে না। ভিখারী গায়িকাকে গোপনে ঘরের মধ্যে ডেকে এনে বাক্স থেকে সেই বাঁধানো লাইন টানা খাতা বের করে নেয়। বিচিত্র বানানে গানের লাইনগুলি লিখে ফেলে। লিখতে লিখতে তার চোখ জলে ভরে যায়। গানের লাইনগুলি এরূপ –

“পুরো বাসি বলে, উমার মা,
তোর হারা তারা এলো ওই।
শুনে পাগলিনী প্রায় অমনি রানী ধায়–
কই উমা, বলি, কই।
কেঁদে রানী বলে, আমার উমা এলে–
একবার আয় মা, একবার আয় মা,
একবার আয় মা, করি কোলে।
অমনি দু বাহু প্রসারি, মায়ের গলা ধরি
অভিমান কা কাঁদি রানীর বলে–
কই মেয়ে বলে আনতে গিয়েছিল।”^{২১}

উমার পড়াশোনার খবর তার স্বামী প্যারীমোহন জানতে পারলে তার খাতা কেড়ে নেওয়া হয়। প্যারীমোহন তার বোনের সঙ্গে সেই খাতাকে নিয়ে হাসাহাসি করতে থাকে। উমার লেখা উচ্চস্বরে পড়তে থাকে। আসলে নারীশিক্ষা তাদের কাছে এক হাস্যস্পদ বিষয়। প্যারীমোহন আর কখনো উমাকে সেই খাতা ফেরত দেয়নি। পুরুষতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থা এভাবেই নারীশিক্ষাকে কেড়ে নিয়েছিল। উপহাসের মধ্য দিয়ে এক উজ্জ্বল সম্ভাবনা এভাবেই অকালে অবদমিত হয়েছিল। গল্পকার রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর উমা চরিত্রের পরিণতির মধ্য দিয়ে সমাজের, বিশেষ করে পুরুষতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার সমালোচনা করেছেন। চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছিলেন নারীশিক্ষা প্রসারে কিভাবে নারীদের পদে পদে বাধার সম্মুখীন হতে হয়েছিল।

রবীন্দ্র ছোটগল্পগুলি বিচিত্র বিষয়ে পরিপূর্ণ। গল্পকার সমাজের নানা রকম চরিত্র এবং তাদের চারিত্রিক বিবর্তন নিয়ে পরীক্ষা নিরীক্ষা করেছেন তার বিভিন্ন ছোটগল্পগুলিতে। আমাদের এই আলোচনায় আমরা নির্বাচন করেছি তিনটি শিশু-কিশোরী চরিত্র, সঠিক ভাবে বলতে গেলে কিশোরী চরিত্র যেগুলি বাংলা সাহিত্যে বহু চর্চিত এবং আলোচিত। নতুন দৃষ্টিভঙ্গিতে এইসব কিশোরী চরিত্রগুলির মনস্তাত্ত্বিক দিকের বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করা হয়েছে।

Reference:

১. চৌধুরী, শ্রীভূদেব, বাংলা সাহিত্যের ছোটগল্প ও গল্পকার, মডার্ন বুক এজেন্সি প্রাইভেট লিমিটেড, কোলকাতা - ৭৩, পঞ্চম সংস্করণ, পৃষ্ঠা সংখ্যা - ৯৭
২. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, গল্পগুচ্ছ অখণ্ড সংস্করণ, নারায়ণ পুস্তকালয়, কোলকাতা- ৭৩, চতুর্থ সংস্করণ, বইমেলা ২০১০, পৃষ্ঠা সংখ্যা - ২৪
৩. তদেব, পৃষ্ঠা সংখ্যা - ২৬
৪. তদেব, পৃষ্ঠা সংখ্যা - ২৬
৫. তদেব, পৃষ্ঠা সংখ্যা - ২৬
৬. তদেব, পৃষ্ঠা সংখ্যা - ২৯
৭. তদেব, পৃষ্ঠা সংখ্যা - ১৩০
৮. তদেব, পৃষ্ঠা সংখ্যা - ১৩২
৯. তদেব, পৃষ্ঠা সংখ্যা - ১৩২
১০. তদেব, পৃষ্ঠা সংখ্যা - ১৯০
১১. তদেব, পৃষ্ঠা সংখ্যা - ১৯০
১২. তদেব, পৃষ্ঠা সংখ্যা - ১৯০
১৩. তদেব, পৃষ্ঠা সংখ্যা - ১৯০
১৪. তদেব, পৃষ্ঠা সংখ্যা - ১৯০
১৫. তদেব, পৃষ্ঠা সংখ্যা - ১৯১
১৬. তদেব, পৃষ্ঠা সংখ্যা - ১৯১
১৭. তদেব, পৃষ্ঠা সংখ্যা - ১৯২
১৮. তদেব, পৃষ্ঠা সংখ্যা - ১৯২
১৯. তদেব, পৃষ্ঠা সংখ্যা - ১৯২
২০. তদেব, পৃষ্ঠা সংখ্যা - ১৯২
২১. তদেব, পৃষ্ঠা সংখ্যা - ১৯৩